খেয়াল

'খেয়াল' শব্দটি পারসিক শব্দ যার অর্থ কল্পনা, উদ্দাম ভাবনা, ঝোঁক ইত্যাদি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের অন্তর্গত এই নিবদ্ধ সংগীতের স্থান ধ্রুপদের পরেই। খেয়াল গান বলতে আমরা বুঝি এমন এক ধরনের গানকে যা কল্পনাত্মক এবং গায়কের মর্জির উপর খানিকটা নির্ভরশীল। বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের দিক থেকে গায়কের খেয়াল খুশিকে আশ্রয় করে, তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী বিন্যাস্ত এই গানের রাগের কাঠামো ছাড়া ধ্রুপদ গানের মত দৃঢ় বন্ধন পাওয়া যায় না।

খেয়াল গানের ধর্ম, বন্ধন থেকে মুক্তি। ধ্রুপদ গান হল স্থাপত্য আর খেয়াল গানের গায়ক সেই স্থাপত্যের অঙ্গে সুরের রেখায়িত গতির বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ দিয়ে রাগবিস্তার ও অলংকরণ করে ইচ্ছামত লতা ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে থাকেন। এইজন্য শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায় খেয়াল প্রসঙ্গে বলেছেন- "ধ্রুপদের রাগ বিস্তারের পদ্ধতি ছিল বাঁধাধরা, তালছন্দও ছিল প্রধানতঃ গাম্ভীর্য্যমুখী। খেয়ালের ঔদার্য্যগুণেই তাদের এই বজ্রা আঁটুনি থেকে রাগ পেল অব্যাহতি"।

খেয়াল গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা মত পাওয়া যায়। কোনমতে ত্রয়োদশ শতকে পারস্য সংগীত কাওয়াল, কালবানা থেকে আমীর খসরুর প্রভাবে ভারতীয় সংগীতে এর আগমন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কৈবাড়, রাসক বা একতালী প্রবন্ধ গান রয়েছে এর উৎসমুখে। আক্ষিপ্তিকা নামক স্বর, শব্দ, তাল সমন্বিত গানকেও খেয়াল গানের উৎস মুখ বলা হয়।

আমীর খুসরো(১২৫৪-১৩২০) নামের সঙ্গে খেয়াল গায়কীর জন্মবৃত্তান্ত অনেকটাই কিংবদন্তি নির্ভর। বর্তমানে প্রচলিত খেয়াল গান সৃষ্টির সঙ্গে ইতিহাসের জৌনপুরের রাজা সুলতান হোসেন শর্কীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৌনপুরে প্রচলিত প্রেম ও বিরহ মূলক দুটি কলিতে নিবদ্ধ চুটকলা নামে ক্ষুদ্র গীতের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল খেয়াল গান। এটি জৌনপুরে প্রচলিত এক প্রকার লোকসংগীত।

বর্তমানে খেয়াল গান প্রচলিত ও প্রসারিত হয়েছিল মূলতঃ সাদারঙ্গ, আদারঙ্গ দ্বারা। সদারঙ্গের কাওয়ালবংশীয় শীষ্যদ্বয় জানরসুল ও গোলামরসুল এই গানের পূর্ণ প্রচার করেন। গোয়ালিয়র নিবাসী নথথন পীরবক্স ধ্রুপদী বংশোদ্ভব হলেও সদারঙ্গের খেয়াল গান গাইতেন। তাঁর পৌত্রদ্বয় হুদ্যু খাঁ ও হস্যু খাঁ খেয়াল গানের ব্যাপক প্রচার করেন। বিচিত্র তান পদ্ধতি, বহুবিধ গমক, মীড়, বোল বানী বিস্তার, স্বরবিস্তার, সরগম অলংকরণ দ্বারা খেয়াল গান গাওয়া হয়। প্রেম, বিরহ, শৃঙ্গার ইত্যাদি রস প্রধান উপজীব্য।

<u>খেয়াল গায়ন পদ্ধতি:-</u> খেয়াল গানের অবয়বটি খুব সংক্ষিপ্ত। দুটি তুকে নিবদ্ধ যথা- স্থায়ী ও অন্তরা। বর্তমানে আমরা দুটি পদ্ধতির খেয়াল গানের সঙ্গে পরিচিত। একটি হল বিলম্বিত বা বড় খেয়াল যার লয়টি হয় বিলম্বিত, অপরটি মধ্য বা দ্রুত লয়ের যাকে বলা হয় ছোট খেয়াল বা দ্রুত খেয়াল। খেয়াল গানের ইতিহাসে জানা যায় দ্রুত খেয়ালের জন্ম হয়েছে আগে, পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলম্বিত লয়ের বিস্তার যুক্ত বড় খেয়ালের জন্ম হয় সুলতান হোসেন শর্কীর দ্বারা জৌনপুরের লোকগীতি স্তরের গান চুটকলা থেকে। সদারঙ্গ এইরূপ গানের নবরূপায়ণ করেন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে।

বিলম্বিত খেয়াল আরম্ভ করার আগে বিশেষ পদ্ধতিতে 'আ'-কার সহযোগে রাগের সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ করা হয়। তারপর বন্দিশটি শুরু করে রাগের বিস্তার বা বঢ়ত করা হয় গানের সঙ্গে- 'আ'-কার বা গানের বাণী সহযোগে ধীর মন্থর গতিতে। এতেও দুটি ভাগ থাকে- স্থায়ী ও অন্তরা। বিস্তার হয়ে যাবার পর 'সরগম' অলংকরণ দ্বারা রাগ রূপায়ণ করে চারগুণ ও

আটগুন লয়েই বেশিরভাগ তান করা হয়। বড় খেয়ালে ও বিভিন্ন প্রকার তান, বোলতান করার নিয়ম আছে। ধ্রুপদে যেমন মীড়, গমক বেশি, বিলম্বিত খেয়ালে মীড়, গমকযুক্ত তান ছাড়াও অন্যান্য তানেরও প্রয়োগ বেশ দেখা যায়। বিলম্বিত গানে তবলা সঙ্গত করা হয় প্রধানতঃ বিলম্বিত লয়ের একতাল, তিলুয়াড়া, ঝুমরা, আড়াচৌতাল ইত্যাদিতে।

বড়ো খেয়াল গাইবার পর একই রাগের স্থায়ী অন্তরা যুক্ত চপল গতির ছোট খেয়াল গাওয়া হয়। এই খেয়ালে শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য থাকে। স্থায়ী, অন্তরা সাধারণতঃ দুই লাইনে রচিত হয়, কখনো এক লাইনেও গানের বন্দিশ থাকে। বন্দিশগুলি প্রধানত ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদিতে বাঁধা থাকে। ছোট খেয়ালে সামান্য বিস্তারের সুযোগ থাকে। বিবিধ প্রকার তানের অলংকার, বোলতান, সরগম ইত্যাদি দ্বারা দ্রুত লয়ে এই খেয়াল গাওয়া হয়। ধ্রুপদের তুলনায় গাম্ভীর্য কম বলে খেয়াল গানে তবলা সঙ্গত করা হয়। বড় খেয়াল ও ছোট খেয়ালের মূল পার্থক্য হল লয়ের। সেই জন্য বড় খেয়াল ছোট খেয়ালের চাইতে একটু গম্ভীর চালের হয়। বর্তমানে খেয়াল একটি জনপ্রিয় সাংগীতিক রীতি।

ডঃ বিমল রায়, ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ, পৃ. পৃ. ২৫৩-২৫৫।